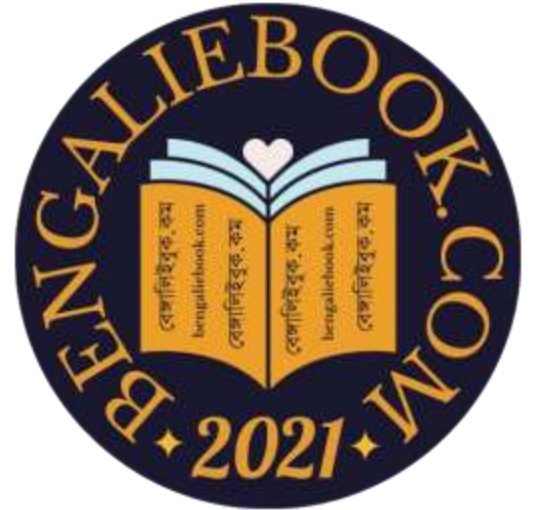


প্রবন্ধ

প্রাচীনা এবং নবীনা

বক্সিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



প্রাচীনা এবং নবীনা

আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র; সমাজের গতি পর্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। “এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর,” ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেবল আজিকালি হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়; উদাহরণ—মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল। আবার দিনকতক ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওক্‌বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন, আপাততঃ অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল না; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালি স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য; পরিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালি যুবকের চরিত্রে যে রূপ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালি যুবতীগণের চরিত্রে সে রূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল, না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যিক? এ সকল

প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্বও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেনা ইহাতে ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্মবিপ্লব পর্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাসিস্ স্ত্রীগণ ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন ইহাতে ইংলণ্ড প্রটেস্ট্যান্ট—

—Gospel light first dawned
From Bullen's eyes—

ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম, কর্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ত্ব কীর্তন কালে এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে, এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম; কিন্তু এ কথাগুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে, পুরুষই মনুষ্যজাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয়; স্ত্রীগণ পুরুষের শুভাশুভবিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদের প্রধান কথা এই যে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; কেন না স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সনাব ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের

সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য, এ কথা নীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্বকালে সর্বদেশে এই ভ্রমে পতিত। তাঁহারা বিধান করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ আচরণ করিবে।—কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাজবিধাতৃদিগের সর্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্রই বিদ্যমান। এই জন্যই সর্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি; পুরুষের সেই ধর্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্বারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান; একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, একস্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেইই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুগিরির মধ্যে গণ্য; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়; কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্য হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যিক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যিক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রতচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে নিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্তা; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অতিরেকে তিলান্দ্র নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অবস্থাবিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার

অভাব; সহমরণ বিধি; বহুকালপ্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী, দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজিকালি পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক বা ইংরাজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্তন হইতেছে, তাহার সর্বাত্মকই কি উন্নতিসূচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থাতেই ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই; কিন্তু বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা কি উন্নতি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে পূর্বকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যিক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যিক। পূর্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়ী সিন্দূরকৌটা মনে পড়িবে; বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাজা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে পৈছা, কঙ্কণ, এবং শঙ্খ (যাহার জুটিল, তাহার বাউটি নামে সোনার শঙ্খ)–মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জনী বা রন্ধনের বেড়ি; কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দূরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি; এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে পর্বশৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর। আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে, খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত। যাঁহারা এবস্থিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইঁহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠভৃগের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মার্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না; কেন না, তাঁহারা “পোড়ারমুখো” “ডেকরা” ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং “আবাগী” “শতেক খুয়ারী” প্রভৃতির শব্দ আধুনিক “সখী” “ভগিনী” স্থলে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্নপ্রকৃতি। সে শাঁখা শাড়ী সিন্দূর মিশি মল মাদুলী, কিছুই নাই; অনাভিধানিক প্রিয় সম্বোধনসকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে; যেখানে আগে মোটা মনসাপেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে, রূপের জাহাজের পাল লইয়া সোহাগ-বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতা বেড়ি ঝাঁটা কলসীর পরিবর্তে, সূচ সূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে; কবরী মূর্দ্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে; এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ড ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দমরঙ্গিনীগণ সাবান সুগন্ধদাদির মহিমা বুঝিয়াছেন; কলকণ্ঠধ্বনি পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেকরা সর্ব্বনেশে নহে; তত্তৎস্থানে সম্বোধনপদসকল দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। জ্বল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়্য বিবেচনা করি। তাঁহাদিগের কোন প্রকারে নিন্দা করা আমাদের ঘোরতর বেআদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্ম্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;—প্রথম শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাগণের, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এবং অপূর্ব্ব লাভণ্যবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাগণের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্ন শয্যাশায়িনী হইলে গৃহের

শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের প্রতি অযত্ন হয়; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সর্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাঁহারা ভালবাসে; তাহারও নিত্য রুগ্নের সেবায় দুঃখ সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং দম্পতিপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকালমৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্যপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন, ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না।

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কালমহিমা; কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে, নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবর্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালিরা বহুরোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্ত্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই।

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না; ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন; রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এতদূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য করিলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি ঘৃণিতরূপে জীবননির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবর্দ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া,

শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া, এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হইবেন।

গৃহিণী গৃহকর্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুপ্ত যায়; অর্ধেক দাসদাসী এবং অপর লোক চুরি করে। বহু ব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কষ্টকময় হয়।

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্মিক বলিতেছি না,—বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্মে লঘু সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম গৃহস্থের ধর্ম বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম পাতিব্রত। অদ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত-ধর্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিব্রত যেরূপ দৃঢ়প্রস্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিব্রত যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল; নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দাভয়ে, তত ধর্মভয়ে নহে।

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদের

পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতী নহে। ইংরেজি সভ্যতার ফলে দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে; স্ত্রীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে, এজন্য দানে তাদৃশ অনুরাগ আর নাই। তত দান করিলে আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে; দানের আধিক্য করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোক (এবং পুরুষে) আর তত দানশীল নহে।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসৎকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহালাদির দ্বারা পরিতুষ্টকরণ পক্ষে এতদেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাগণের মধ্যে সে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হইতেন। লোককে আহালা করান প্রাচীনাগণের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ মনে করেন।

ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন, প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধর্ম্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হইতেন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রহণ করিতেন না। আমরা লেখাপড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল, ইহা সর্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্ম্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্ম্মিষ্ঠ, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্বারা উচ্ছিন্ন হয়; অথচ সত্য ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম্ম

যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্তী হয়। তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্তী, কিন্তু তিনি ধর্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তি অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে, ধর্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকারবিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে, তদ্বারা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অতচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্মে বিশ্বাস জন্মে, ততদূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন; এজন্য ধর্মাংশে তাঁহারা প্রাচীনাдиগের সমকক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন? *

তিন রকম

নং ১

বঙ্গদর্শনে “নবীন এবং প্রাচীন” কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা স্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখি। জানেন না যে, সম্মার্জনী স্ত্রীলোকেরই আয়ুধ।

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ত্যাগ কোন্ দিকে ভারি হইবে?

*“নবীনা ও প্রাচীনা |” এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা নিম্নলিখিত কৃত্রিম পত্র তিনখানিতে লিখিত হইয়াছিল।

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব? শুন, প্রাচীন নবীনে প্রভেদ কি, বলি। প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন; তোমরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন পিতা-মাতাকে; নবীনের ভক্তি করা পত্নী বা উপপত্নীকে। প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন; তোমাদের দেবতা টেস ফিরিজি, তোমাদের ব্রাহ্মণ সোনার বেনে। সত্য বটে, তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে তোমরা অনেকেই ধ্যানেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছে; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে ব্রাণ্ডি, রম, জিন। বিষয়, সেরি তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃস্নেহ সম্বন্ধীর উপর বর্তিয়াছে, অপত্যস্নেহ ঘোড়া কুকুরের উপর বর্তিয়াছে; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বর্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি? পাচিকার উপরে। আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহা বিপদ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস; তোমরা শুধু অলস নও—তোমরা বাবু! তবে ইংরেজ বাহাদুর নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখাপড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের ধর্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শুঁড়ি, আর একদিকে বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে; তোমরা ধর্ম-দড়িতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেমসাগরে বাঁপ দিতেছ—গরিব “নবীনা” খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্মের ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা? যিশুখ্রীষ্ট? ধর্ম মান? পাপ পুণ্য মান? কিছু না—কেবল আমাদের এই আলতা-পরা মল-বেড়া শ্রীচরণ; সেও নাথির জ্বালায়।

শ্রীচণ্ডিকাসুন্দরী দেবী

নং ২

সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিস্করীকুল কোন্ দোষে দোষী? আমরা কি জানি?—আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব—আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য,—কিন্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে “নবীনার” প্রতি এত কটুক্তি কেন?

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে, জাতিতে কাঠমল্লিকা, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছি—দোষ না থাকিবে কেন? তবে কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। আপনারা আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনারা রূপের ছায়া দেখিয়া দিন না কাটাইবে?

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী—তাহার কারণ, আমরা স্বামী পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন যে, অন্য ধর্মের আর স্থান নাই।

আর—শেষ কথা, আমরা কি ধর্মভীতা নহি? হি! ধর্মভীতা বলিয়াই, আপনাদিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদের ধর্ম। তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়া, অন্য ধর্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম কর্ম আমরা স্বামী পুত্রে সমর্পণ করিয়াছি—অন্য ধর্ম জানি না। লেখাপড়া শিখাইয়া আমাদের কোন্ ধর্মে বাঁধিবেন? যত শিখান না কেন—আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিড়িয়া এই পাতিব্রত্য বন্ধনে আপনা আপনি বাঁধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর যদি আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য—আপনারা আমাদের কোন ধর্ম শিখাইয়া থাকেন?

লেখাপড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখাপড়ায় কি তত? তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্মশিক্ষা, লেখাপড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমরা

আত্মবিসর্জন শিখিয়াছি, লেখাপড়ায় কি তাহা শিখাইবে? আর লেখাপড়া শিখিব কখন?
তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখাপড়া শিখিব কখন?

ছি! দাসীদিগের নিন্দা!

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

নং ৩

ভাল, কোন্ রসিকচূড়ামণি “নবীনা এবং প্রবীণা” লিখিলেন?

লেখক মহাশয়! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য—একটি মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে,—কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? এ বিজরি তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারান্নকারে কোথায় আলো পাইতে? আমরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না; জলশূন্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশূন্য বাছুরের মত হাস্কারবে তোমাদের গৃহগোহাল, পরিপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না! এ কলকণ্ঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে!—কপালখানা! আবার বলেন কি না, কাজ করে না!

আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না;—দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না—যাইবার সময় যাও যেন নন্দদুলাল—ফিরে এস যেন কুম্ভকর্ণ! নিজের নিজের উদর—এর একটি আধমণি বস্তা—আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই—তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত!

ধর্মের বন্ধনে বাঁধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখাপড়া শিখিয়া,—ধর্মের বন্ধন আঁটো করিয়া বাঁধিতে রাজি আছি। আমার মনে বড়

সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন; আপনারা স্বর্গারোহণ করিলে আমরা “দ্বিতীয় সংসার” করিব—জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রক্তনশালার তত্ত্বাবধান করিবেন,—বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গোঁপের উপর ঘোমটা টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না।—আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব—বয়সকাল ফিরিঙ্গি খোঁপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপিসে যাইব—টৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব,—চসমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিব—সাধের ধর্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসার গোহালে খোল বিচালি খাইব।—ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই—তোমরা যখন মানে বসিবে—মারা যখন মানে ভাগিতে বসিবে—মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা পরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব—তখন? তখন কি তোমরা আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে?

বড়াই ছাড়িয়া তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস—আমরা আপিসে যাই। যাহারা সাত শত বৎসর পরে জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না? শ্রীরসময়ী দাসী।